



স্বাধীনতা সংগ্রামে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের শিক্ষা ও সমাজ চেতনা

ড. জয়ন্তী মাইতি

সহ অধ্যাপিকা, শিক্ষাবিভাগ, স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপঃ স্বাধীনত্বের সময়ে, বাংলা সাহিত্যের পাশাপাশি দেশ মাতৃকা সেবার এবং সমস্ত অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী রূপ যিনি তরুন সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন, ব্রিটিশ শাসকরূপী দানব মুক্ত করে তোলার জন্য একটি সু সংগঠিত দলীও নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহন করেছিলেন, তিনি কাজী নজরুল ইসলাম। সমাজ, ব্যক্তির অন্তরে বিদ্রোহী সত্ত্বার আগ্নিশিখার স্ফুৎলিঙ্গ তাঁর গান, কবিতা, সাহিত্য প্রতিটি লেখনী শক্তির মাধ্যমে স্পষ্টতা দেখা যায়। সাম্যবাদ নামক স্বাধীনতার মুক্তি চিন্তার মাধ্যমে সমাজ গঠন ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য।

শব্দসূচকঃ সাহিত্য, সমাজ, স্বাধীনতা, শিক্ষা।

নিজের অধীনতা ত্যাগকেই আমরা পরাধীনতা আখ্যায়িত করি। স্ব-অধীনতার জন্য চাই সজ্ঞানতা। অতি সাধারণ এবং ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ এই পরাধীনতাকেই ভবিতব্য বা আশির্বাদ রূপে মেনে নিয়েছিল। নব্য শিক্ষিত যুব সমাজ মাতৃ ভাষায় ঘরে-বাইরে বাক্যালাপেও নিষ্পৃহ হয়ে উঠল। ১৮৪৮ সালে অক্ষয়কুমার দত্ত মন্ত্র দান করলেন, “জননী জন্মভূমি স্বর্গদপি গরীয়সী”। তিনি নব্য-শিক্ষিতদের উদ্দেশ্য করে স্মরণ করিয়ে দেন যে মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি উদাসীনতা অপরাধ। এই সচেতনতা ছিল নজরুল-মানসের মৌল প্রবণতা। তিনিই হয়ে উঠলেন বাংলা ভাষার প্রথম রাজনীতি সচেতন কবি।

ভাববিলাসী সমাজ সাহিত্য-কর্মকে কেবল শিল্পের প্রকাশ ভাবে। তাই অনেকের সমালোচনায় তিনি হয়ে উঠেছিলেন

‘হুজুগের কবি’। নজরুল কখনও তাঁতে পূজ্য রবীন্দ্রনাথ হতে চাননি, আবার কবিগুরুই সমকালে সবচেয়ে ভালো বুঝেছিলেন নজরুল-স্বরূপকে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ‘কপালকুন্ডলা’ উপন্যাসে মন্তব্য করেছিলেন, “বাঙ্গালী অবস্থার বশীভূত, অবস্থা বাঙ্গালীর বশীভূত নয়।” নজরুল তা মানতে চাননি। সে জন্য নজরুল এমন ‘আঁধারে’ যখন ‘অগ্নিসেতু’ বাঁধতে চাইলেন; কবিগুরুই প্রথম অভিনন্দিত করলেন ‘বসন্ত’ নাটিকা উৎসর্গ করে। কেবল আনন্দ-বিনোদনের জন্য রসমিশ্র শিল্পের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য, কারণ সমাজে রুচিসম্পন্ন মানুষ দুর্লভ নয়, কিন্তু নজরুল তাঁর কাব্য-সাহিত্যকে শিল্পবোধ বজায় রেখেও দু-চারজন বিদগ্ধ শিল্প-সমালোচকের খোরাক না বানিয়ে গণমানুষের স্বাধীনতার হাতিয়ার করে তুললেন।

বিবেক একদিকে ব্যক্তিগত, আবার একই সঙ্গে ব্যক্তি-অতিক্রমী। তিনি মানবের সেই বিবেকেই চাবুক কষালেন, “হৃদয়ের চেয়ে বড় কোন মন্দির-কাবা” জগতে নেই। এই হৃদয়ই তো বিবেক। ঊনবিংশ ও বিংশ শতকে স্বদেশিকতা এবং প্রগতিশীলতা বোধের প্রতি শ্রদ্ধা তাঁর কাব্য-সাহিত্য নিয়ন্ত্রণ করেছে। জাতি ও ধর্মের গভীর উর্ধ্বে উঠে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় বিশ্বাস রেখে তিনি বললেন, “মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান”, প্রকৃত অর্থে তিনি সাম্য ও স্বাধীনতার কবি।

কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী। তিনি বাংলা কাব্য ও সাহিত্যের প্রচন্ড বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন। দেশে স্বাধীনতা ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য অত্যাচারী শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তিনি কলমকে অস্ত্র হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। তার কবিতা, গান, নাদ, গজল, গল্প এবং উপন্যাস প্রতিটি বাঙালির মনকে করে তুলেছিল জাগরিত। নজরুল রাজনৈতিক সংগ্রামে বিশ্বাস করতেন। তিনি নিজে সমগ্র অবিভক্ত বাংলায় চষে বেড়িয়েছেন ও অবিভাষণ দিয়েছেন। ‘আমার সুন্দর’ প্রবন্ধে তিনি লিখলেন, “আট বৎসর ধরে বাংলাদেশের প্রায় প্রতি জেলায়, প্রতি মহকুমায়, ছোট বড় গ্রামে ভ্রমণ করে দেশের স্বাধীনতার জন্য গান গেয়ে, কখনো কখনো বজুতা দিয়ে বেড়লাম। এই প্রথম আমার মাতৃভূমি বাংলাদেশকে ভালোবাসলাম। মনে হল, এই আমার মা। তাঁর শ্যাম-স্নিগ্ধ মমতায়, তাঁর গভীর স্নেহ-রসে, তাঁর উদার প্রশান্ত আকাশে কখনো ঘন, কখনো ফিরোজা-নীলে আমার দেহ-মন-প্রাণ শান্ত-উদার আনন্দ-ছন্দায়িত হয়ে উঠল।” এ চেতনা মস্তিষ্ক প্রসূত নয় — বিবেক প্রসূত। তাঁর গান, তাঁর কবিতা হয়ে উঠেছিল স্বাধীনতা সৈনিকদের বীজ-মন্ড। তাই আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র-নেতাজী প্রমুখ ব্যক্তি বর্গ ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর এলবার্ট

হলে তাঁকে ‘জাতীয় কবি’-র তকমা দিলেন। তাঁরা ঘোষণা করলেন যে নজরুল একজন ‘জ্যাস্ত কবি’।

ব্রিটিশ পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তির জন্য কাক্ষিক্ষিত বিপ্লবে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষ ভারতীয় সব নাগরিকের সমান অংশগ্রহণ তিনি প্রত্যাশা করেছেন। তাই অন্তরে মানবতার মশাল জ্বালিয়ে সব সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে সম্মিলিত প্রতিরোধের আহ্বান জানিয়েছেন তিনি এ প্রবন্ধে- ‘এস ভাই হিন্দু! এস মুসলমান! এস বৌদ্ধ! এস খ্রিস্টিয়ান! আজ আমরা সব কাটাইয়া, সব সংকীর্ণতা, সব মিথ্যা, সব স্বার্থ চিরতরে পরিহার করিয়া প্রাণ ভরিয়া ভাইকে ভাই বলিয়া ডাকি। আজ আমরা আর কলহ করিব না। চাহিয়া দেখ, পাশে তোমাদের মহাশয়নে শায়িত ঐ বীর ভাতৃগণের শব।’ নজরুল বিশ্বাস করতেন স্বচ্ছ বিবেকশক্তির অধিকারী ও সঠিক কর্তব্যজ্ঞানসম্পন্ন মানুষই জাতির সঙ্কটকালে পথ নির্দেশ করতে পারেন। ব্রিটিশ বন্দিদশায় আচ্ছন্ন মানুষের অধিকার লঙ্ঘনে মর্মান্বিত নজরুল আত্মমর্যাদাহীন, পরাধীন জাতিকে সর্বোচ্চ ত্যাগের মহিমায় উজ্জীবিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। ফলে প্রবন্ধটিতে জাতিকে জাগিয়ে তোলার তীব্র চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে। নজরুল বলেছেন-“... বাহিরের স্বাধীনতা গিয়াছে বলিয়া অন্তরের স্বাধীনতাকেও আমরা যেন বিসর্জন না দেই। আজ যখন সমস্ত বিশ্ব মুক্তির জন্য, শৃঙ্খল ছিড়িবার জন্য উন্মাদের মত সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতেছে, স্বাধীনতা যজ্ঞের হোমানলে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা দলে দলে আসিয়া নিজের হৃৎপিণ্ড- উপড়াইয়া দিতেছে, তাহাদের মুখে শুধু এক বুলি, ‘মুক্তি-মুক্তি-মুক্তি’।” বিপ্লবীদের স্বপক্ষে লেখনী ধারণে সাক্ষী রূপে নজরুল ইসলাম ‘অগ্নিবীণা’ কাব্যের ‘প্রলয়োন্মাস’ ‘আগমনী’ ‘রক্তাস্বরধারিণী মা’ ‘ধূমকেতু’, ‘রণভেরী’ ইত্যাদি কবিতার মাধ্যমে দেশের তরুণদের ইংরেজ বিরোধী শক্তি হিসেবে

দাঁড় করাতে চেয়েছেন। এই সব কবিতার মাধ্যমে নজরুল ইসলাম ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শহিদ আশ্রাসী চেহারাটি তরুণ সমাজের কাছে তুলে ধরতে চেয়েছেন। সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ বেনিয়াদের কবল থেকে মুক্তির জন্য যে প্রবল শক্তিমত্তার প্রয়োজন 'অগ্নিবীণা' কাব্যে নজরুল প্রগলভ, উদ্দামতা ও সাহসিকতার উপস্থাপন করেছেন। বিদ্রোহী কবিতায় নিজের রণোন্মত্ততার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি স্পষ্ট করে জানিয়েছিলেন--

“আমি উপাড়ি, অধীন বিশ্ব অবহেলে নবসৃষ্টির মহানন্দে
মহা বিদ্রোহী রণক্লান্ত

আমি সেইদিন হব শান্ত,

যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না

বিদ্রোহী রণক্লান্ত

আমি সেইদিন হব শান্ত।”

ভীরা ও কাপুরুষতাকে ত্যাগ করার আহ্বান: ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে পূর্ণ স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনা বেশ কঠিন কাজ। এই কঠিনকে সম্ভব করতে পারে একমাত্র যুবশক্তি। তাই কবি স্বাধীনতার জন্য দেশের যুবকদের ভীরা ও কাপুরুষতাকে ত্যাগ করে রক্তচক্ষু দুঃশাসনকে চ্যালেঞ্জ করার উদাত্ত আহ্বান জানান নজরুল রাজনৈতিক পত্রিকা প্রকাশ করলেন — ‘ধূমকেতু’। তিনি অনেকের কাছে আশীর্বানী-র প্রার্থনা করলেও একমাত্র রবীন্দ্রনাথ দ্বিধাহীন এগিয়ে এলেন।

“আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু,

আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু,

দুর্দিনেরই দুর্গশিরে

উড়িয়ে দে তো বিজয় কেতন !

অলক্ষণের তিলকরেখা

রাতের ভালে হোক না লেখা,

জাগিয়ে দে রে চমক মেরে’

আছে যারা অর্দ্ধচেতন।”

সমাজ-স্বাধীনতা-রাজনীতি সচেতন কবি এটিও উপলব্ধি করেছিলেন যে সমাজকে শুধু পরাধীন মোচন করলেই হবে না। তার সঙ্গে চাই শিক্ষা। কবিগুরুও এ ব্যাপারে সচেতন ছিলেন এবং নিজস্ব শিক্ষা-ভাবনাকে বাস্তবে রূপায়ণ করতে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নজরুলের সে সংগতিও ছিল না বটে, তবে তাঁর রাজনৈতিক পত্রিকার মাধ্যমে শিক্ষা সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করেছেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে একাধিক পত্রিকা সম্পাদন করেছেন। পূর্বোল্লিখিত ধূমকেতু ছাড়াও ছিল নবযুগ, লাঙল, গণবাণী প্রভৃতি।

তিনি শিশুকালে গ্রামের মজ্জবে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। নিজে উপলব্ধি করেছেন মুসলিম শিশুদের শুধু ধর্মীয় শিক্ষা দিলেই হবে না। তার সাথে তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানেও বিকশিত করতে হবে। তাই মজ্জব-এ পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য রচনা করলেন স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ। ৩১শে জুলাই ১৯৩৫-এ প্রকাশিত হয় ‘মজ্জব সাহিত্য’। এই গ্রন্থে যেমন ইসলাম-চেতনা প্রকাশ পায়, সাথে সাথে প্রথম ভারতীয় রসায়ন অধ্যাপক ড. চুনীলাল বসুর ‘আমাদের খাদ্য’ রচনা, কবিগুরুর দুটি কবিতা, কুসুমকুমারী দাসের একটি কবিতা প্রভৃতিও পাঠ্য-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেন। শিশু অবস্থায় যাতে তাদের মনে ধর্মভাব অঙ্কুরিত হওয়ার সাথে সুনাগরিক ও সং ব্যক্তি হয়ে ওঠার প্রবণতা সৃষ্টি হয়। ১৯২০ সালে তিনি যে সাক্ষ্য দৈনিক ‘নবযুগ’ পত্রিকা সম্পাদন করেন, তার কতকগুলি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ গ্রন্থবদ্ধ করে ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবরে প্রকাশ করেন ‘যুগবাণী’ গ্রন্থ। একটি সংখ্যায় তৎকালীন জাতীয় শিক্ষা বলিয়া যে বিপুল সাড়া পড়েছিল, তার প্রতি ব্যঙ্গোক্তি করিয়া প্রবাদ ব্যবহার করেন ‘টকের

ভয়ে পালিয়ে গিয়ে তেঁতুল তলে বাসা'। সমালোচনায় তিনি উল্লেখ করেন, “শুনিয়াছি, ‘বন্দে মাতরমের’ যুগে যখন স্বদেশি জিনিসের সওদা লইয়া দেশময় একটা হৈ হৈ ব্যাপার, রৈ রৈ কান্ড পড়িয়া গিয়াছিল, তখন অনেক দোকানদার বা ব্যবসায়িগণ বিলাতি জিনিসের ট্রেডমার্ক বা চিহ্ন দিব্যি চাঁচিয়া-ছুলিয়া উঠাইয়া দিয়া তাহাতে একটা স্বদেশী মার্কা মারিয়া লোকের নিকট বিক্রয় করিতেন। এখন যে পদ্ধতিতে জাতীয় শিক্ষা আমাদের ভবিষ্যৎ আশা-ভরসাস্থল নব-উদ্ভাবিত জাতীয় বিদ্যালয়ে দেওয়া হইতেছে, তাহাও ঠিক ঐ রকম বিলাতি শিক্ষারই ট্রেডমার্ক উঠাইয়া ‘স্বদেশী’ মার্কা লাগাইয়া দেওয়ার মতো”। তিনি ঐ প্রবন্ধে প্রশ্ন তুলেছেন, “শুধু চরকা দিয়া সূতা কাটানো ছাড়া এ-ন্যাশানাল বিদ্যালয়ে তেমন কিছু নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় নাই, যাহা সম্পূর্ণরূপে আমাদের দেশের ছেলেদের মনের বা এ-দেশের আবহাওয়া উপযোগী।” তিনি নতুন শিক্ষা নীতিকে কটাক্ষ করেছেন ‘সাহেবকে ধুতি ও মেমকে শাড়ি পরাইয়া বাবু ও বিবি সাজানো’ বলে। কবি পরিশেষে আক্ষেপ করেছেন, “দৈশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বা দেশের লোক কতকগুলি ভূতের বাথান ও আখড়া পাকাইবার জন্য বুকের রক্তসম টাকার আড়ি হুড় হুড় করিয়া ঢালিয়া দেন নাই।” আসলে শিশুকাল থেকেই শিক্ষার প্রতি তাঁর আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়। অনেকেই তাঁর বাউন্ডুলেপনা ও স্কুল পালানো নিয়ে নানান মুখরোচক গল্প পরিবেশন করেন। তাই যদি হবে তবে একটানা চার বছর পড়ে নিয়ম মতো দশ বছর বয়সে প্রাথমিক পরীক্ষায় পাস করেন কিভাবে ? জীবনে শত বাধা সত্ত্বেও কত ছুটেছেন। বর্তমান বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলায় দরিরামপুর। শিমলা থেকে জলকাদায় হেঁটে পাঁচ মাইল দূরে স্কুলে যাতায়াত করেছেন। পরে ছাত্রীও পড়িয়েছেন এবং ভাল ছাত্র হওয়ায় স্কুলের কাছেই

লজিং-এ থাকা-খাওয়ার করেছেন। প্রথমে চুরুলিয়ায় বিনোদবিহারী চট্টোপাধ্যায়ের পাঠশালায় কিছুদিন পাঠ নেওয়ার পর ছয় বৎসর বয়সে স্থানীয় মজুবে ভর্তি হয়ে দশ বৎসর বয়সে নিম্ন প্রাথমিক ফাইনাল উত্তীর্ণ হন। দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের সহায়তায় মাথরুন নবীন চন্দ্র ইনস্টিটিউশনে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ নেন। রোজগারের প্রয়োজনে ১৯১২-১৩ শিক্ষাবর্ষ নষ্ট হয়। গ্রামে ফিরে লেটোর দলে গান, লেখা, আসানসোলে রেলের নেটিভ ক্রিস্চান গার্ড সাহেবের বাড়ীতে বয়ের কাজ, মহম্মদ আহাদ বখসের বেকারী ও রুটির দেকানে শিশু শ্রমিক, দারোগা কাজী রফিজউল্লাহর বাসায় ভৃত্য ইত্যাদি বাধা অতিক্রম করে দরিরামপুরে সপ্তম শ্রেণী। এসে ভর্তি হন বর্ধমান শহরে Albert Victoria Institute বা নিউ স্কুলে। কিন্তু কিছুদিন পরেই স্কুলটি উঠে যায়। ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শিয়ারশোল রাজস্কুলের নবনিযুক্ত প্রধান পদে নিযুক্ত হন। তাঁর সদয় আনুকূল্যে কবি অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হন গ্রীষ্মের ছুটির আগে অথবা পরে। ১৯১৭ সালে দশম শ্রেণীতে পড়া কালীন সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। এর মধ্যে একবার মেধার জন্য ডবল প্রমোশনও পেয়েছেন। তাঁর সাহিত্য ও পত্রাদি থেকে বোঝা যায় আরবি-ফারসি-হিন্দি-উর্দু ভাষাগুলিতে তাঁর নৈপুণ্য ছিল।

এ হেন শিক্ষাপ্রেমী কবির শিক্ষা সম্পর্কে আগ্রহ স্বাভাবিক। তিনি উপলব্ধি করতেন শিক্ষাই জাতি গঠনের সোপান। তাই ‘জাতীয় শিক্ষা’ সম্পাদকীয় প্রকাশের পর আবার ‘যুগবাণী’ পত্রিকায় সম্পাদকের কলমে প্রশ্ন তুললেন, “.... জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিকুলাম কি ? স্ট্যান্ডার্ডেরই বা কোনো একটা নিয়ম-কানুন বা প্রোগ্রাম আছে কি ? হইবে কখন ?” শেষে আবারও লিখলেন, “আমরা চাই, আমাদের

শিক্ষা-পদ্ধতি এমন হউক, যাহা আমাদের জীবন-শক্তিকে ক্রমেই সজাগ, জীবন্ত করিয়া তুলিবে। যে শিক্ষা ছেলেদের দেহ-মন দুইকেই পুষ্ট করে, তাহাই হইবে আমাদের শিক্ষা। ‘মেদা মারা’ ছেলের চেয়ে সে হিসাবে ‘ডানপিটে’ ছেলে বরং অনেক ভালো। কারণ পূর্বোক্ত নিরীহ জীবরূপী ছেলেদের ‘জান’ থাকে না; আর হইবেও না। এই দুই শক্তিকে — প্রাণ-শক্তি আর কর্ম-শক্তিকে একত্রীভূত করাই যেন আমাদের শিক্ষার বা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হয়, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা”। বাস্তবিক তিনি নিজেও ছিলেন প্রাণ-চঞ্চল, শিক্ষানুরাগী, বন্ধু-বৎসল, দেশমাতৃকার পায়ে নিবেদিত প্রাণ, ধর্মাত্মতা বর্জিত, সাম্যবাদী একটি সম্পূর্ণ মানুষ। শিক্ষা তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির প্রতি ছত্রে ছত্রে। যখন তিনি শিশু-কাব্য লেখেন, তখন নিজে দাদু সেজে নাতি-নাতনিদের উপদেশ দেন না — ‘কদাচ মিত্যা বলিবে না’। বরং নিজেই শিশু হয়ে বাবুদের তাল-পুকুরের কাছে যে লিচু গাছের ডালে চড়ে নিচু চুরি করতে গিয়ে মড়াং করে ডাল ভেবে সড়াং করে মালির ঘাড়েই পড়ে কিল ও ঘুসি খান। দুট্টু বাচ্চা পড়তে মজা পায় নিজের মত সাথী পেয়ে। দাদুর উপদেশের বিপদে পড়তে হয় না, কিন্তু লিচু চোর কবির করে বিপথে চালিত হয় না। শেষে যখন দেখে —

“..... যার ফের ? কান মলি ভাই,

চুরিতে আর যদি যাই!

তবে মোর নামই মিছা!

কুকুরের চামড়া খিঁচা

সে কি ভাই যায় রে ভুলা —

মালির ঐ পিটনিগুলা!

কি বলিস? ফের হণ্ডা

তৌবা নাক খপ্তা।”

হ্যাঁ, এই আট পক্ষতি আর পাঠ্য থাকে না, এ যেন তারই বলা। কারণ সে বুঝেছে কু-কর্মের কু-ফল। বলা যায় এ হল নজরুলী শিক্ষা। তাঁর শিশু-নাটিকা ‘পুতুলের বিয়ে’ নিছক মজার নয়, তাতেও শিশুদের নৈতিক জীবন গড়ে ওঠে ধর্মা-ধর্মের বিভেদ ঘুচিয়ে এক অভেদ-ধর্মের বোধে।

গণ সঙ্গীতকেও তিনি অন্য মাত্রায় নিয়ে গেছেন। সেখানে তিনি রাজনৈতিক নেতা হয়ে শ্রমিকদের না-বোঝা আন্দোলনের শরীক বানাননি। ধীবনর-চাষি সকল শ্রমিকের মেরুদণ্ড সোজা করে বাঁচতে শিখিয়েছেন। ছাত্রদলকে কেবল পুঁথি গলাদ্ধকরণ করে শুষ্ক-পণ্ডিত না হয়ে প্রাণবন্ত চলমান করেছেন, —

“... সবাই যখন বুদ্ধি যোগায়, আমরা করি ভুল।

সাবধানিরাই বাঁধ বাঁধে সব, আমরা ভাবি কুল।

দারুণ রাতে আমরা তরুণ রক্তে করি পথ পিছল!

আমরা ছাত্রদল।”

আবার বেতারে ধর্মীয় গীতি-আলেখ্য করছেন — ‘দেবীস্তুতি, তা কেবল ভক্ত-মনের দশমহাবিদ্যার স্তব নয়; বরং দেবীর বিভিন্ন প্রকাশের দর্শন তত্ত্ব ব্যাখ্যাও হয়েছে। অর্থাৎ সব কিছুর মধ্যেই শিক্ষা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সৌভাগ্যবান, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামের মত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় বিদ্যালয়ের গভী না পেরোন দুই মহান শিক্ষাবিদকে এন্স্টটারন্যাল এক্সামিনার রূপে বরণ করে। সুতরাং শিল্পীর বহুমুখীর অধিকারী তাঁর কবিতা, গান, সাহিত্য, লোকসঙ্গিত , ভাস্কারে গজল, ইসলামিক আধ্যাত্মিক গান হল এর সুরের মিলন যা মানবতা, আধ্যাত্মিকতা , দেশপ্রেম, সমতাবাদ অবদান দেখা যায় আর এখানেই কবির অবদান।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জীঃ

- মুজাফফর আহমেদ, (১৯৬৫). কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতিকথা. ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড।
- কাজী নজরুল ইসলাম.(১৯২৬,২১শে জানুয়ারি). 'লাঙল' পত্রিকাঃ কলকাতা।
- কাজী নজরুল ইসলাম.(১৯২৬,২৮শে জানুয়ারি). 'লাঙল' পত্রিকাঃ কলকাতা।
- ড. চৌধুরী.জয়ন্ত.(২০১৭,ডিসেম্বর). 'সুভাষ- নজরুল সম্পর্কের সাদৃশ্য ও বর্তমান'. ইন্সটিটিউট অব নজরুল স্টাডিজ: জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়।
- রফিকুল ইসলাম, (১৯৭২). নজরুল জীবনী. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
- সাজেদ কামাল, (১৯৯৯). কাজী নজরুল ইসলাম: এ করণোলজি অফ লাইফ. ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর নজরুল।
- https://en.wikipedia.org/wiki/Kazi_Nazrul_Islam
- <https://www.targetsscbangla.com>
- <https://m.somewhereinblog.net/mobile/blog/anisurrahman2015/29206094>
- <https://www.bangal-kobita.com>